International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-IV, January, 2020, Page No. 01-08
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

রাজবলহাট : একটি বিখ্যাত আধা নগর

অরিন্দম গায়েন
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, নেতাজী সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Rajbalhat is a famous village under Srirampur subdivision of Jangipara block of Hooghly district in the Indian state of West Bengal. In Ancient time, this village belonged to Bhursut state. The name Rajbalhat comes from the name of Sri Sri Rajballabhi Devi. So the name of this place is Rajbalhat. This temple was established by bhursut king Rudranarayan. In this village numerous terracotta temples of ancient time can be seen. Radhakanta Temple, Sridhar Damodar Temple is some of the examples, which were built during the eighteenth century. Of course, some terracotta temples that were built during the sometime, they are now destroyed and nowhere any trace of their previous existence can be found. Three shiva atchala temples are present beside the Rajballabhi Temple. Poet Hemchandra Bandyopadhay was born in this village. In this village there is a museum called the invaluable museum. Besides, Hemchandra memorial library has been established. Rajbalhat is the home of Dulal Chandra Bhor, the father of the Talmishri art of Bengal. The famous chariot is seen in this village, which is next to the Dasghara Chariot of Hooghly.

Keywords: Martin's Railway Company, Bhurshut Kingdom, Maa Rajballavi, Sreedhor Damodar Temple, Radhakanta Temple, Rajbalhat School, Poet Hemchandra Bandyopadhay, Amulyo Protnosala.

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার জাঙ্গীপাড়া ব্লকের অন্তর্গত রাজবলহাট একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। হাওড়া - তারকেশ্বর মেইন শাখায় হরিপাল রেলস্টেশন থেকে নেমে বাস বা অটোয় সহজেই রাজবলহাটে যাওয়া যায়। এটি হরিপাল স্টেশন থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত। কলকাতা থেকে রাজবলহাটের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি। অতীতে আঁটপুর রেলস্টেশন থেকে নেমে ৫ কিমি পূর্ব দিকে অবস্থিত এই প্রাচীন বিখ্যাত গ্রাম রাজবলহাট। এই স্টেশনটি ছিল হাওড়া-আমতা-চাঁপাডাঙ্গা রুটের রেলপথের উপরে। রেলপথটি ছিল মার্টিন লাইট রেলওয়ে কোম্পানির বা সংক্ষেপে বলা হয় 'MLR'। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এই কোম্পানি স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এই কোম্পানিটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে রাজবলহাটে পর্যটকদের আসার সংখ্যাও কমে যায়। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই আধা নগরে বাণিজ্যিক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই সময় হতে রাজবলহাট একটি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। কুটিরশিল্পের কেন্দ্র এই গ্রামকে বলা হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকে এই গ্রামে অনেক তাঁতি বাস করেন। বর্তমানে তাঁতির সংখ্যা খুবই কম। এখানকার অধিকাংশ মানুষ কৃষক ও তন্তুময় কাজের সাথে যুক্ত। বহুদিন থেকেই এই গ্রাম তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। ১৪ টি পাড়ার মধ্যে দেব, দাস, শীল, ভড় নিয়ে গঠিত হয়েছিল তাঁতিপাড়া। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় সপ্তাহে দুদিন বাজার বসিত। রাজবলহাটে সোনার কাজ ও তাঁতের কাপড়ের জন্য

বিখ্যাত হয়ে আছে এবং এখনো এখানকার কাপড়ের চাহিদা প্রসিদ্ধি আছে। এখানে অসংখ্য টেরাকোটার মন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

রাজবলহাটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম। এই গ্রামের পাশ দিয়ে দুটো নদী প্রবাহিত হয়েছে। একদিকে দামোদর নদী আর অন্যদিকে রণ নদী। তৎকালীন সময়ে রাজবলহাট একটি প্রসিদ্ধ ছোট বন্দর ছিল। এই বন্দরের সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন বাজারে আমদানি-রপ্তানি হত। অতীতে ভুরশুট রাজ্যের রাজধানী ছিল এই প্রাচীন জনপদ রাজবলহাট। এই ভুরশুট ছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের হাওড়া ও হুগলী জেলা নিয়ে গঠিত একটি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রাজ্য। রাঢ় অঞ্চলের দক্ষিনাঞ্চলের এদের বসবাস ছিল। ভুরশুট শব্দটি এসেছে ভূরিশ্রেষ্ঠ থেকে। সুধীরকুমার মিত্র তাঁর 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে দ্বিতীয় খন্ডে লিখেছেন -"ভূরিশ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ 'বহু বণিকের বসতি'; ভূরি অর্থাৎ বহু, শ্রেষ্ঠী মানে বণিক, অর্থাৎ যে স্থানে বহু বণিক বসবাস করেন। মুসলমান রাজত্বকালে ভুরশুট একটি প্রখ্যাত পরগনা ছিল"[1]।

পাল সাম্রাজ্য যখন শুরু হয় তখন কোনো এক অঞ্চলে এক রাজা ভুরশুট রাজ্য শাসন করতেন। এই রাজ্যের একাধিক রাজা রাজ্য শাসন করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই রাজ্যের ধীবর রাজবংশের কথা জানা যায়। এই ধীবর রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন শনিভাঙ্গর। তিনি গড় ভবানীপুরের রাজা চতুরানন্দ নিয়োগীকে পরাজিত করেছিলেন। চতুরানন্দের পরবর্তী বংশধর রাজা কৃষ্ণ রায় ভুরশুট দখল করেন। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে কৃষ্ণ রায় ১৫৮৩-১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ভুরশুট শাসন করেন। তাঁর বড় নাতি প্রতাপনারায়ণ রায় ভুরশুট রাজাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন।

ভুরশুট বংশের এক রমণীর কথা জানা যায়। তিনি হলেন রানী ভবশঙ্করী। তিনি অতি সাহসী মহিলা ছিলেন। ভুরশুটের রাজা রুদ্রনারায়ণের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর তিনি রাজ্য শাসন পরিচালনার দায়িত্বভার নেন। সেই সময় পাঠান সর্দার ছিলেন ওসমান খাঁ। তিনি মোঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রানীর সাহায্য চায় কিন্তু রানী এই যুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করে, ফলে ওসমান ভুরশুট রাজ্য আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। গড় ভবানীপুর ছিল ভুরশুটের রাজধানী। সেখান থেকে কিছু দূরে মন্দিরে পুজো দিতে গেলে ওসমান তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে রানীর উপর হামলা চালায়। ফলে দু পক্ষের তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন ওসমান। এই খবর পেয়ে মুঘল সম্রাট আকবর রানী ভবশঙ্করীকে 'রায়বাঘিনী' উপাধিতে ভূষিত করেন। বিধুভূষন ভট্টাচার্য তাঁর 'রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী' গ্রন্থে লিখেছেন – "রক্তবস্ত্র পরিধান এই রমণীমূর্তি যখন শূলহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করত তখন মনে হত যে মানবী রূপে মহেশ মনোমোহিনী মহা শক্তিরুপিনী, মহিষমর্দিনী দুর্গা দনুজ দলন করবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ন হয়েছেন"[2]।

ভুরশুট রাজ্যের তিনটি দুর্গ ছিল। এগুলি হল – গড় ভবানীপুর, পাণ্ডুয়া ও রাজবলহাট। এই দুর্গ গুলির সম্বন্ধে এখন আর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এগুলি এখন ধ্বংসাবশেষ অবস্থায় আছে। তবে রাজবলহাটের কাছে দামোদর নদের তীরে 'ডিহি ভুরশুট' বলে একটি জায়গা এখনও আছে। 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায়, "সুলেইমানাবাদ সরকারের অধীনস্থ ৩৩টি মহলের মধ্যে বসুন্ধরী পরগনার পরেই ভুরশুট পরগনা থেকে সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় হত। সপ্তগ্রাম সরকার বা মান্দারন সরকারের অন্য কোনো পরগনা এত রাজস্ব আদায় করত না। ১৮শ শতাব্দীতে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ রায় ভুরশুট জয় করেন"[3]।

দে-পাড়া অঞ্চলে রাজবাড়ির প্রাচীন নির্দশন এখনও দেখা যায়। সুদূর অতীতে এখানে চন্ডাল রাজা রাজত্ব করতেন বলে কথিত। ভুরশুট রাজবংশের প্রাসাদ সম্পর্কে হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটারে বলা হয়েছে যে : "Remnants of a palace of the Basantapur branch of the Bhursut Raj family are still to be seen at the Depara locality. The ruins are Popular ascriebed to one Chandal raja who have ruled in the place in the past"[4]. "ভূরশুট রাজবংশের বসন্তপুর শাখার বিবরণে দেখা যায় যে, রাজবলহাটে সাত বিঘা জমির উপর রাজার গড়বাটি ছিল এবং দেবী রাজবল্লভী ঠাকুরাণীর নামে দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল পাঁচ শত বিঘা। দেবীর প্রচুর ভূসম্পতি অধিকাংশই প্রায় বেদখল হয়েছিল। অন্যায়ভাবে যারা দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ দখল করেছিল, তা উদ্ধার করবার জন্য ২৬ শে বৈশাখ ১৩৪৪ সাল রাজবল্লভী স্টেটের জিম্মাদার তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর সভাপতিত্বে মাতার সেবক ও ভক্তগণের সহযোগে 'রাজবল্লভী সেবা সমিতি' গঠিত হয়। বিশ বছরের চেষ্টায় সেবা সমিতি দেবোত্তর স্টেটের ও সেবাপুজার প্রচুর উন্নতিসাধন করেছেন"[5]।

চিত্র : রাজবল্লভী মাতার মন্দির, রাজবলহাট, হুগলী

দামোদর আর রণ নদীর বেষ্টিত গ্রাম রাজবলহাট। ত্রয়োদশ শতকে সদানন্দ রায় এই নদী বিধৌত জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাকে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে রাজপুরের উত্থান ঘটান এবং গড়ে তোলেন এক বিশাল হাট। তিনি রাজবল্লভীর স্বপ্নাদেশে মন্দির তৈরি করেন। এই রাজবল্লভীর মা এর নাম এবং হাটের নাম যুক্ত হয়ে হয় রাজবল্লভী হাট, পরে তা হয়ে ওঠে রাজবলহাট। 'রাজবলহাট' নামটি এসেছে শ্রীশ্রী রাজবল্লভী দেবীর নামানুসারে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে রাজবল্লভী দেবীর মন্দিরটি বেশ কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে এবং এই মন্দিরে প্রাচীনত্বের কোনো নির্দশন বতর্মানে নেই। রাজবল্লভী দেবী সাদা কালী নামেও পরিচিত, দুর্গা, কালী এবং সরস্বতীর মিশ্র রূপ। এই কালী মায়ের মন্দির হল রাজবলহাটের একটি ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান। রাজবলহাট সংলগ্ন এলাকায় দেবী দুর্গা রাজবল্লভী দেবী রূপে পূজিতা হন। মন্দিরের পাশে পাল-সেন যুগের নির্মিত একটি বিষ্ণুমূর্তি আছে। এছাড়া শিবের তিনটি আটচালা

রীতি বর্তমান। মন্দিরের পাশেই একটি নাটমন্দির আছে। ষোড়শ শতকে ভুরশুটের রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

রাজবল্লভী দেবীর মূর্তি অদ্ভূত এবং মাটির মূর্তি। গঙ্গা মাটি দিয়ে তৈরি এই মূর্তি। প্রায় ছয় ফুট উচ্চতায় রাজবল্লভী দেবীর মূর্তিটি সাদা রঙের। বাম পায়ে বসে বিরুপাক্ষ শিবের উপর এবং ডান পা বিশ্রাম মহাকাল ভৈরবের বুকে। বাম হাতের তালুতে আছে একটি সিঁদুরের পাত্র আর ডান হাতে দেখা যাচ্ছে ছুরিকা। কোমরে ছোট ছোট কাটা হাতের মালা। গলায় ঘণ্টা মালা। বিভিন্ন শহর ও গ্রাম থেকে আসা ভক্তরা দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজবলহাটে মিলিত হয়। সকাল সাতটায় মন্দিরের দরজা খোলে। এগারোটায় পুজো শুরু হয়ে দুপুর দুটোয় ভোগ নিবেদন করা হয়। সাতটায় সন্ধ্যারতি হয়। আরতি শেষে মাকে নিবেদন করা হয় লুচি, সন্দেশ ও ছানা। মন্দির থেকে কিছু দূরে রাজবল্লভী মাতার বিরাট দীঘি বা পুকুর আছে। নাম 'রাজবল্লভী দীঘি'। ভুরশুটের রাজা সদানন্দ রায় এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুধীরকুমার মিত্র তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন – " ১৩৪০ সালের ১১ ই আষাঢ শ্রীফকিরচন্দ্র, মন্মথনাথ ও জহরলাল ভড় মন্দির ভেঙে যাওয়ার পর বহু টাকায় মন্দিরের আমূল সংস্কার করে দেন। ১৩৪৬ সালে তারা পুনরায় মন্দিরের কাছে বিরাট নাটমন্দির নির্মাণ এবং নহবতখানা, গড়, মায়ের পুকুরের ঘাট, মন্দির সংলগ্ন চারটি শিবমন্দির তৈরি করে দেন। দেবী রাজবল্লভী চন্ডিরই রূপান্তর বলে মনে হয়। 'পীঠনির্ণয়' গ্রন্থে রাজবলহাটকে শাক্তপীঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং পিঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'চন্ডী' বলে উক্ত হয়েছে। চন্ডী প্রাচীনকালে অনার্য দেবী ছিলেন, পরে আর্য ও অনার্যের দীর্ঘ সংঘাতের ফলে তিনি লোকসমাজের পূজা হয়েছেন" [6]। 'রাজবল্লভী মাহাত্ম্য' নামে পুস্তকে দেবীর যে বর্ণনা আছে, তা হল :

'মন্দিরে শোভিছে মাতা শ্রীরাজবল্লভী
শরৎ জোৎস্না প্রভা বিশালা ভৈরবী।
বিল্বমালা গলেছুরি ধরে ডান হাতে
প্রসারিত বাম হস্তে পাত্র শোভে তাতে।
রণরঙ্গিনীর মূতি-ভীমা সুনয়না
বরাভয় প্রদায়িনী, প্রসন্ন আননা।
উজ্জ্বল মুকুট শিরে ত্রিলোক জননী' [7]।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চন্ডিকাব্যে রাজবল্লভী সম্বন্ধে লিখেছেন :

'রাজবোল বন্দি রাজবল্লভীর চরণ।
ইলিপুরে রঙ্গিনী বন্দো হয়ে একমন' [8]।।

রাজবলহাট গ্রামে একটি বিখ্যাত প্রাচীন প্রবাদ আছে। প্রবাদটি হল– "চার চক, চৌদ্দ পাড়া, তিন ঘাট, এই নিয়ে হয় রাজবলহাট"। কথাটির অর্থ হল, চার চক বলতে দফর চক, সুখর চক, বৃন্দাবন চক আর বদুর চক অর্থাৎ চারটি ক্রসিং ; চৌদ্দ পাড়া বলতে নন্দী পাড়া, দে পাড়া, মনসাতলা, শীলবাটি, ভড়পাড়া, উত্তরপাড়া, দিঘিরঘাট, কুমোর পাড়া, বাড়ুয্যে পাড়া, দাস পাড়া, কুঁড় পাড়া, নস্করডাঙ্গা, সানা পাড়া ও পান পাড়া অর্থাৎ চৌদ্দটি স্থানীয় অঞ্চল ; তিন ঘাট বলতে দিঘির ঘাট, মায়ের ঘাট ও বাবুর ঘাট অর্থাৎ তিনটি স্নানের অঞ্চল।

চিত্র : রাধাকান্ত মন্দির, রাজবলহাট, হুগলী

রাজবল্লভী মায়ের মন্দির দর্শন করার পর এবার পৌঁছালাম শীল পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত শীলদের শ্রীধর দামোদর মন্দির ও ঘটকতলায় ঘটক পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্তদেব জিউ মন্দির। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীধর দামোদর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। শীল বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী লম্বোদর শীল এই টেরাকোটা মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটি আটচালা রীতিতে তৈরি, তবে এই আটচালা নির্মাণ রীতির বিশেষত্বের দাবি না রাখলেও এই মন্দিরের অলংকরণগুলি বিশেষত্বের দাবি রাখে। মন্দিরের দেওয়ালে টেরাকোটার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের প্যানেলগুলিতে রামায়ণের যুদ্ধলীলা, জাহাজ-নৌকা, ফুল, লতা-পাতা এবং বিভিন্ন দেবদেবীর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। 'শ্রীধর দামোদর মন্দির ১৬৪৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত' বলে একটি ফলকে লেখা আছে। হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটারে বলা হয়েছে - "The Damodar temple of the Silpara locality constructed in 1724 also contains terracotta embellishment"[9]। অতীতে এই মন্দিরটি কালো শ্যাওলা অক্ষত অবস্থায় ছিল, বর্তমানে এর লাল রং পরিবর্তন করা হয়েছে। 'শ্রীধর দামোদর মন্দিরের মধ্যে শ্রীধর ও দামোদরের শালগ্রাম শিলা আছে। এইগুলি সুন্দর একটি সিংহাসনের মধ্যে রক্ষিত। সিংহাসনের তলায় লিখিত আছে :

গোবিন্দ শীল ঐ কন্যা
ক্ষিরোদমোহিণী দাসী'[10]।

ঘটকতলায় ঘটক পরিবারের রাধাকান্ত মন্দিরটি ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এটিকে জিউ মাতার মন্দির বলা হয়। মন্দিরটি ত্রিখিলানবিশিষ্ট এবং উচ্চতা প্রায় ৫০ ফুট। আটচালা রীতিতে তৈরি এই মন্দিরটি সামনের দিকে দেওয়ালে প্রচুর টেরাকোটার চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। ফলকগুলির মধ্যে আছে দেবতা, রামায়ণের কাহিনী, পশু ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলংকরণ বিদ্যমান। এছাড়া বেশ কিছু সামাজিক ছবি চোখে পড়ে, যেমন - জাহাজ-নৌকা, রাজকীয় রথ এবং মিছিলের চিত্র ইত্যাদি। মন্দিরের প্রাঙ্গণে আরও অনেকগুলি দেব-দেউল ছিল, সেগুলো এখন বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'হুগলী জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে লিখেছেন,- "দত্ত পরিবারের দামোদর

মন্দিরটি ১৭২৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এটি পঞ্চরত্ন, সামান্য টেরাকোটা অলংকরণযুক্ত। চক্রবর্তী পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আটচালা সীতারাম মন্দিরটি ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার ও বহির্ভাগে 'টেরাকোটা'র কারুকার্য বিশিষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কুণ্ডুদের প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ মন্দিরটি একরত্ন এবং বহির্ভাগে সামান্য টেরাকোটা অলঙ্করণযুক্ত। এছাড়া সানা পাড়ার শিবমন্দির অষ্টাদশ শতকের নির্মিত। রাজবল্লভী ট্রাস্টের দ্বারা রক্ষিত আরও চারটি আটচালা শিবমন্দির উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত"[11]।

উত্তরপাড়ায় ঘটকতলাতে রাধাকান্ত মন্দির রথ যাত্রার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেখানে ঘটক উপাধিকারী এক ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল এবং তারা খুব বিত্তশালী ছিলেন। এই রথটি তাদেরই পরিবারের ছিল। যেখানে রথের মেলা বসে সেখানে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের মাঠ, সমস্ত জায়গাটি ঘটক বংশীয় পরিবারের ছিল। পরবর্তীকালে তাদের বংশ লোপ পেলে ব্যানার্জ্জী পাড়ায় মনিন্দ্র ব্যানার্জ্জী ওই বাড়ির ভাগ্নে ছিলেন। রথ, বিদ্যালয়ের জায়গা এবং রাধাকান্ত মন্দিরটির উত্তরাধিকারী হন। ব্যানার্জ্জী পরিবার প্রতিদিন রাধাকান্ত মন্দিরে পুজো করেন। গ্রামে বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হলে গ্রামবাসীর অনুরোধে মনিন্দ্র ব্যানার্জ্জী জায়গাটি বিদ্যালয়কে দান করেন। খেলার মাঠ দান করেন এবং তিনি রথটিকেও বিদ্যালয়কে দান করে দেন।

রাজবলহাটের রথযাত্রা অনেক আগ্রহের সাথে উদযাপিত হয়েছে। গ্রাম চত্বরে এইখানে রথযাত্রা উদযাপিত হয়। দশঘরা ও শ্রীরামপুর মাহেশের পর এই রথের স্থান। গ্রামের মানুষেরা ভগবান, জগন্নাথ ও শুভদ্রাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উদযাপিত করে। মধ্যযুগ থেকেই রাজবলহাটের রথযাত্রা শুরু হয়ে আসছে। এই রথ যাত্রার ক্ষেত্রে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য স্থান অধিকার করে আছে। রথ জগন্নাথ, বলরাম এবং শুভদ্রার প্রতিমা বহন করে না বরং রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি বহন করে। রথটি ছিল কাঠের তৈরি, উচ্চতা প্রায় ৯ চূড়া বিশিষ্ট। ১৯৪৯ সালে কাঠের রথটি ভেঙে গেলে গ্রামের মানুষরা লোহার রথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। লোহার রথ তৈরি হতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। গ্রামের প্রাক্তন শিক্ষক সুশীল কুমার ভড়ের মতে বলা যায় –'লোহার রথ নির্মাণের জন্য লোহার চাকার প্রয়োজন হল। কলকাতা সেন্ট্রাল এভিনিউ এবং দর্জিপাড়ার মাঝে একটি মাঠে লোহার চাকা রাখা ছিল অনেকদিন ধরে। চাকাগুলি ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত ট্যাংকের চাকা। চাকাগুলি মার্টিন রেলে করে আসতো এবং আঁটপুর স্টেশনে নামানো হত এবং সেখান থেকে গরুর গাড়ি করে রাজবলহাটে নিয়ে আসা হত'। এছাড়া এই গ্রামে প্রধান বড় উৎসব হল শিবের চরক মেলা। বাইরের গ্রাম থেকে আসা পুরুষ-নারীরা এই মেলায় আনন্দ উপভোগ করে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে মেদিনীপুর বাড়ি যাবার পথে রাজবলহাট চটিতে (সরাইখানা) এক রাত্রি থাকতেন। তিনি যে অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করতেন সেই অঞ্চলের শিক্ষার উন্নতির কথা ভাবতেন। গ্রামের মানুষদের করুণ অবস্থা দেখে তিনি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সরকার বাড়ির সদর বাড়িতে প্রথম বিদ্যালয় তৈরি হয়। পড়ানোর পাশাপাশি ছাত্র ভর্তি করানো ছিল শিক্ষক মহাশয়দের কাজ। আস্তে আস্তে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকলো। গ্রামবাসীদের আর্থিক সহযোগিতায় ছিটে বেড়ার প্রাচীর ও বিচালির ছাউনির দিয়ে তৈরি হল নুতন ঘরের জন্য। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মহেন্দ্র সিংহ রায়। তিনি রাজবলহাট পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টারের কাজ করতেন। বর্তমানে যে গার্লস স্কুলটি আছে, সেটি ছিল নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের বসতবাড়ি। এই বাড়িটিতে ক্লাস অষ্টম পর্যন্ত পড়ানো শুরু হল। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনে তৈরি হল উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় তৈরির জন্য ১১ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা হলেন – হরিপ্রসন্ন সরকার, ভূপতি মোহন চক্রবর্তী, অর্জুন ভড়, নারায়ণ চন্দ্র শীল, মন্মথনাথ ভড়, ধুজু ভড়, অষ্টবিহারী দাস, তোফেল আলী, কালীপদ সাহা চৌধুরী, দাসরথী সুর এবং হরেন্দ্রনাথ বটবাল ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের বিল্ডিং তৈরির কাজে ভূপতিমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের অবদান অবিস্মরণীয়। উনি যে অফিসে চাকরি করতেন, সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে এসে বিদ্যালয়ের নকশা তৈরি করেন **U** প্যাটার্নের। তখনকার দিনে দামোদর নদীতে প্রতি বছর বন্যা হত। তাই বিদ্যালয়ের বারান্দা তৈরি হয় উঁচু করে, যাতে বন্যার জল উপরে

উঠতে না পারে। বড় বড় অশ্বত্থ গাছ শ্রমিকেরা কাটতে ভয় পেল, তখন মন্মথনাথ ভড় মহাশয় একটি রূপার কুঠার তৈরি করে প্রতি গাছে একটি করে চোট দেন তারপর শ্রমিকেরা গাছগুলি কেটে পরিষ্কার করেন। তখনকার দিনে একটি ইটের দাম ছিল ২৫ পয়সা, রাজমিস্ত্রীর পারিশ্রমিক ছিল ৩ টাকা। ১৯১৯ সালে বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন রাজবলহাটের রূপকার, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ভূদেব ভট্টাচার্য। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত থাকার জন্য ভূদেব বাবুর বিচার করেন একজন ইংরেজ বিচারক এবং তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন।

রাজবলহাটে বিখ্যাত কবি ছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল গুলটিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চার ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। কবির পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলীর উত্তরপাড়া গ্রামে। শৈশবে তিনি রাজবলহাট গ্রামে কেটেছিলেন। কবির যখন ১৫ বছর বয়স তখন তার মাতা কবিকে পাঠিয়েছিলেন কলকাতার হিন্দু কলেজের (বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক প্রসন্ন কুমার মহাশয়ের কাছে। প্রসন্ন কুমার মহাশয় কবির মেধার পরিচয় পেয়ে তাঁকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। তিনি বহু কবিতা-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'বৃত্রসংহার' কাব্য। বাংলার ১৩৮০ সালে কবির একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করা হয় এই গুলটিয়া গ্রামে। যেটির আবরণ উন্মোচন করেন তৎকালীন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর রমা চৌধুরী। প্রতি বছর কবির জন্মদিন পালন করা হয়। রাজবলহাট গ্রামের উপর দিয়ে যে মূল সড়কটি গেছে, সেই সড়কটি কবির নাম অনুসারে 'হেমচন্দ্র রোড' রাখা হয়।

রাজবলহাট গ্রামে একটি বিখ্যাত মিউজিয়াম আছে। মিউজিয়ামটি হল 'অমূল্য প্রত্নশালা'। প্রত্নতত্ত্ববিদ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নামানুসারে 'অমূল্য প্রত্নশালা' বিদ্যমান। ১৩৪৮ সালে এটি স্থাপিত হয়। শ্রীফকিরচন্দ্র ভড় ও শ্রীজহরলাল ভড় কর্তৃক নির্মিত এই মিউজিয়ামটি তৈরি হয়। ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এই প্রত্নশালার সম্পাদক ছিলেন। বিচারপতি মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রত্নশালাটি উদ্বোধন করেছিলেন। এই প্রত্নশালাতে প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক পুরাবস্তুর জিনিসপত্র রাখা আছে। এই প্রত্নশালার পাশে হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে:

'হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার ও অমূল্য প্রত্নশালার জন্য
স্বর্গীয় ভূষণচন্দ্র ভড় ও তদীয় পত্নী যাদুবিন্দু দাসীর
স্মৃতিকল্পে তদীয় পুত্রগণ
শ্রীফকিরচন্দ্র ভড় শ্রীজহরলাল ভড়
কর্তৃক এই ভবন নির্মিত হইল
২১ শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৫৩ সাল'

অমূল্য প্রত্নশালা সম্বন্ধে সরকারী গ্রন্থে আছে: "Amulya Pratnasala – The museum has a rich collection of antiquities and art objects, small ornamental terracotta plaques, art objects from Nepal, an image of Vishnu assignable to the Pala period, coins, manuscripts, the personal diary of Acharyya Jagadischandra Basu etc. The library known as Hemchandra Society Pathagar has 7000 books and a membership of 235"12।

তথ্যসূত্র:

1) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৯১১
2) বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকাহিনী, নবভারতী প্রকাশনী।
3) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৯১১
4) ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটার: হুগলী, উৎস সুধীরকুমার মিত্র দ্বিতীয় খন্ড।
5) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ৯১১
6) সুধীরকুমার মিত্র,পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা - ৯১৩
7) 'রাজবল্লভী মাহাত্ম্য' পুস্তক থেকে সংগৃহীত।
8) কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চন্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে সংগৃহিত।
9) হুগলী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটার, উৎস সুধীরকুমার মিত্র দ্বিতীয় খন্ড।
10) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৯১৬
11) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হুগলী জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা - ১১৯
12) সুধীরকুমার মিত্র, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৯১৯
13) তারাপদ সাঁতরা, পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্যে মন্দির ও মসজিদ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, কলকাতা।
14) কমল চৌধুরী, হুগলী জেলার সেকাল ও একাল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
15) কৌশিক পাল চৌধুরী, হুগলী জেলার লৌকিক দেবতা।
16) প্রণব রায়, বাংলার মন্দির চর্চা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা।

তথ্যদাতা:

1) সুশীল কুমার ভড় (প্রাক্তন শিক্ষক), গ্রাম + পোস্ট – রাজবলহাট, ব্লক – জাঙ্গীপাড়া, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২৪০৮
2) সন্টু দে (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), গুলটিয়া হেমচন্দ্র স্পোটিং ক্লাব, গ্রাম + পোস্ট – রাজবলহাট, ব্লক – জাঙ্গীপাড়া, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২৪০৮
3) নিমাই সাহা চৌধুরী (প্রাক্তন শিক্ষক), গ্রাম+পোস্ট – রাজবলহাট, ব্লক – জাঙ্গীপাড়া, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২৪০৮
4) নিশীথ কুমার দে (প্রাক্তন শিক্ষক), গ্রাম+পোস্ট – রাজবলহাট, ব্লক – জাঙ্গীপাড়া, জেলা – হুগলী, পিন - ৭১২৪০৮